# একজন অবাঙালির বাংলা শিক্ষার অভিজ্ঞতা

সুব্রমণিয়াম কৃষ্ণমূর্তি



আমি তামিলভাষী। আমার বাংলা শেখার অভিজ্ঞতা এবং বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করতে আমাকে অনুরোধ করেছেন সম্পাদক মহাশয়। আমার খোলাখুলি মন্তব্যে যদি কোনো পাঠকের মন ব্যথিত হয়, তারজন্য আমি আগেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আমি প্রথমবার কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলাম আমার ২৬ বছর বয়সে। তার আগেই আমার মোটামুটি আয়ত্ত ছিল তামিল, ইংরেজি, সংস্কৃত এবং হিন্দি। আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের দিকপাল বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার সঙ্গে অনুবাদের মাধ্যমে আমি আগেই পরিচিত হয়েছিলাম। ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি আমার সহজাত আগ্রহের কারণে আমি এখানে আসার মাস কয়েক পরেই বাংলা শিখতে উদ্যোগী হলাম। বাংলা সাহিত্য সম্ভারকে মূল ভাষায় আস্বাদ করার সম্ভাবনা আমাকে আরও অনুপ্রাণিত করল।

সে-সময় দক্ষিণ কলকাতাস্থিত ভারতী তামিল সংঘে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে নিয়মিত ভাবে বাংলা শিক্ষার ক্লাস হতো। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিজেই শেখাতেন। মাঝখানে প্রায় একবছর বিখ্যাত সাহিত্যিক অজিত কৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব) মহাশয়ও আমার শিক্ষক ছিলেন। আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর নিয়মিতভাবে বাংলা শিখে সমিতির পরীক্ষাগুলি পাশ করে ‘বঙ্গ সাহিত্য রত্ন’ উপাধি লাভ করলাম।

তখন থেকে আমার বাংলা সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রয়েছে। আমি কয়েকজন বাংলার মনীষীর জীবনী তামিল ভাষায় রচনা করেছি এবং প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থ বাংলা থেকে তামিলে এবং বাংলায় অনুবাদ করেছি। এই সুবাদে আমি অনেক বাংলা সাহিত্যিকদের পরিচয় লাভ করেছি এবং তাঁদের স্নেহে ধন্য হয়েছি। আমার এই সৌভাগ্যের জন্য আমার দুজন গুমহাশয়দের কাছে আমি অশেষ ঋণী।

সংস্কৃত এবং হিন্দি আগেই জানা ছিল বলে বাংলা শিখতে আমার বেশি কষ্ট হয়নি। আমার মনে হল, অন্যান্য ভাষার চেয়ে বাংলা শেখা অনেক সহজ। এর একটা কারণ হয়তো এই যে বাংলায় ব্যাকরণের ‘উৎপাত’ অনেকটা কম। একই সর্বনাম দিয়ে পুষ, স্ত্রী, জানোয়ার, অচেতন বস্তু সবকে চিহ্নিত করা যায় এবং একবচন-বহুবচনে ক্রিয়াপদের রূপ বদলায় না। কিন্তু যে-অবাঙালি সংস্কৃত -হিন্দি জানে না, তার পক্ষে বাংলা শেখা তেমন সহজ নাও হতে পারে।

প্রতিটি ভাষা এবং লিপির একটি স্বতন্ত্র সত্তা থাকে। এই সত্তার মধ্যে তার কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন থাকে, তেমনি কিছু দুর্বলতা বা অসঙ্গতিও থাকে। এই বৈশিষ্ট্য এবং অসঙ্গতিগুলি সেই ভাষাভাষীর চোখে তত সহজে পড়ে না, যত সহজে ভিন্ন ভাষাভাষীর চোখে পড়ে।

আমার মাতৃভাষার কথাই আগে বলব। তামিল এবং অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হল ‘এ’ ও ‘ও’ ধ্বনির হ্রস্ব ও দীর্ঘ রূপ। আরেকটি বৈশিষ্ট্য থাকে ‘ল’ ধ্বনিতে। কন্নড় ও তেলুগু ভাষায় দুটি ‘ল’ আছে ; আবার তামিল ও মলয়ালামে তিনটে ‘ল’। তামিল বর্ণমালায় ব্যঞ্জনের সংখ্যা কম, তাতে মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন একেবারে নেই। ফলে তামিল ভাষা শিক্ষার্থীকে কম অক্ষর লিখতে হয়। কিন্তু এটা খুব একটা সুবিধে নয়, কারণ তামিলে একই অক্ষরের, শব্দে তার অবস্থান অনুসারে একাধিক উচ্চারণ হয়। ‘ত’ এর দুটি উচ্চারণ---‘ত’ ও ‘দ’; ‘ক’এর উচ্চারণ তিনটে--- ‘ক’, ‘গ’ ও ‘হ’; ‘চ’-এর আবার চারটে উচ্চারণ--‘চ’, ‘জ’, ‘শ’ ও ‘স’। এর ফলে যা বিভ্রাট ঘটে তার ধাক্কা তামিলভাষী শিক্ষার্থী তেমন অনুভব করে না, কারণ সে শৈশব থেকেই এই উচ্চারণ-ভিন্নতায় অভ্যস্ত। কিন্তু অতামিল শিক্ষার্থীর পক্ষে এই এক বিভীষিকা। অনেকে এর ধকল সামলাতে পারছে না। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আমি প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ভারতী তামিল সংঘে অতামিলদের তামিল শেখাই। আমার কাছে শিখতে - আসা অনেকেই এই উচ্চারণ জটিলতায় ভয় পেয়ে হাল ছেড়ে দেয়। তামিল অক্ষরমালায় আর কয়েকটি অক্ষর জুড়ে দিলেই এই সমস্যাটা মিটে যায়। কিন্তু তামিল পণ্ডিতদের মধ্যে এই সংস্কারের কোনো চেষ্টা দেখা যাচেছ না।
এখন বাংলা ভাষার কথায় আসা যাক। বাংলা ভাষা শিক্ষার্থী একজন অবাঙালির অনেকরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়--অক্ষরের, বানানের এবং উচ্চারণের।

বাংলা ‘অ’--এর উচ্চারণে ‘ও’--কারের রেশ এসে যায়, যেটা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় আছে বলে মনে হয় না।এর ফলে বাংলায় হ্রস্ব ‘অ’ --এর শুদ্ধ উচ্চারণ প্রায় অসম্ভব। অন্য ভাষার অ-কার যুক্ত শব্দ বাংলা রূপান্তরণে ‘অ’কার হয়ে যায়, যেমন ‘মুত্তন’ হয়ে যায় ‘মুত্তান’, ‘অয়্যর’ হয়ে যায় ‘আয়ার’। এর আরেকটা পরিণাম হল‘ও’ কারের জায়গায় ‘অ’ কারের ব্যবহার---যেমন ‘কেন’ (ক্যানো), ‘কর’ (করো) ইত্যাদি।

একটি সংস্কৃত সূত্রবিধি আছে ‘ব (wa) বা (ba) য়োরভেদঃ’। এই বিধিকে সাধারণ নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে বাংলা। এর ফলে বাংলা অক্ষরমালায় অন্তঃস্থ ‘ব’ হয়ে রইল ঠুঁটো জগন্নাথ, যদিও এই অক্ষরের ‘wa’ উচ্চারণটা সংযুক্তাক্ষরে টিকে রয়েছে। এই অক্ষরকে এরকম পঙ্গু করা হয়েছে কেন ? এরজন্য অনেক অসঙ্গতি দেখা দেয়। ইংরেজি ‘V’অক্ষরের বাংলা রূপান্তর হওয়া উচিত ‘বি’, কিন্তু সেটা হয়ে যায় ‘ভি’। ‘কাবুলিবালা’কে লিখতে হচেছ ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘রিক্শাবালা’কে লিখতে হচেছ ‘রিক্শাওয়ালা’। কিন্তু অন্তঃস্থ ‘ব’-য়ের উচ্চারণকে একেবারে বর্জন করা যাচেছ না। তাই অন্যান্য ভাষার সঙ্গে সমন্বয়ে জন্য ‘বিবেকানন্দ’কে ইংরেজিতে লেখা হয় Vivekananda, ‘ঝিভারতী’ হয় দ্দনবদ্ধ্র-চড়ব্রস্তব্ধন. “ ‘জ’ - ‘য়’-য়োরভেদঃ” -এই সূত্রেরও অত্যধিক প্রভাব পড়েছে বাংলায়। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যেখানে ‘য়’থাকে, সেখানে বাংলায় ‘য’ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ‘য়’ উচ্চারণ একেবারে বাদ যায় না, সেটা রয়ে গেছে শব্দের মাঝখানে বা শেষে। ‘জ’ ও ‘য’-এর মধ্যে উচ্চারণে তফাৎ না থাকলেও তফাতটা মানা হয় বানানের। লেখার সময় একটির বদলে অপরটিকে ব্যবহার করা যায় না। ছাত্রগণ অহরহ এই ভুল করে শিক্ষকের বকুনি খায়।

বাংলা শিক্ষার্থীর আর একটি বিভীষিকা হল সংযুক্তাক্ষর। সংযুক্তাক্ষর সংশ্লিষ্ট অক্ষরগুলির উপস্থিতি আপাতদৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কোনো কোনো সংযুক্তাক্ষরে এই উপস্থিতি দেখা যায় না। এর উদাহরণ---ত্ত, ত্ত, ত্র। শিক্ষক বলেন, ত + ত = ত্ত, ছাত্রকে সেটা মেনে নিতে হয়।

বাংলা উচ্চারণের শিথিলতা সম্বন্ধে বাঙালিরাও অবগত আছেন । বাংলা অক্ষরমালায় শ, ষ, স আছে, কিন্তু সব অক্ষরেরই উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল ‘শ’-এর মতো। অভিধানও এই শিথিলতাকে মেনে নিয়েছে ; সেখানে বহু শব্দের ‘শ’ও ‘স’ এই দুটির বিকল্প প্রয়োগ স্বীকৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে অনেক জায়গায় হ্রস্ব দীর্ঘ বানানোর তফাত মানা হয়না--‘গাড়ী’ও চলে ‘গাড়ি’ও চলে, ‘বাড়ি’ও হয়। ‘উ’-যুক্ত শব্দের উচ্চারণে সামঞ্জস্য নেই---‘বুক’-এর হ্রস্ব উচ্চারণ,‘ভুল’-এর

দীর্ঘ উচ্চারণ। সংযুক্তাক্ষরের উচ্চারণে প্রথম অক্ষরই প্রাধান্য পায়, দ্বিতীয় অক্ষর অনেক সময় অনুচ্চারিত থেকে যায়। এর ফলে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্র সদন'-এর কথা মনে পড়ে। প্রথমে এই গৃহের নামকরণহয়েছিল 'রবীন্দ্রস্মরণী'। কিন্তু এই নামটা 'রবীন্দ্রসরণি' উচ্চারিত হওয়ার বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য নামটা 'রবীন্দ্রসদন' করা হল।

বানানের ক্ষেত্রে বাংলায় একরকম অরাজকতা বিরাজ করছে মনে হয়। অনেক বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়বাংলা ব ানানবিধি প্রবর্তন করেন। বছর কয়েক আগে বাংলা আকাদেমিও বানানবিধি প্রকাশ করেছে। এক হাজার বছর পুরোনো একটি ভাষায় এরকম বারবার বানানবিধি প্রবর্তন করা দরকার পড়ে কেন? সাধারণ বাঙালির, বিশেষ করে বাংলা লেখকরা, এসব বিধি কি মানেন ?

মাত্রার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। আমি অনেক বছর ধরে বাংলা সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, কিন্তু এখনও কোনো বাংলা হাতের লেখা পড়তে পারছি না। বাংলা হাতের লেখা ও ছাপা অক্ষরের মধ্যে বিরাট তফাত। এর অন্যতম কারণ, আমার মনে হয়, লেখার সময় মাত্রার প্রতি অবহেলা। ছাপার অক্ষরে মাত্রা থাকছে সগৌরবে, কিন্তু হাতের লেখায় তার চরম দুর্গতি।

বাংলা লেখায় অতীতকালে সূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে বর্তমানকালে সূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার প্রথমে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, এখন আর করে না। এরকম লেখা এত ব্যাপক যে আমিও এভাবে লিখতে শু করেছি। তবু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, এরকম ব্যাকরণ-বিদ্ধ প্রথার যৌক্তিকতা কী ?

শেষ আসছি ভাষার মিষ্টতা ও অমিষ্টতার প্রসঙ্গে। এটা একটা স্পর্শকাতর বিষয়। প্রতিটি মানুষের কাছে তার মাতৃভাষাই অতি মিষ্টি। একটি তামিল প্রবাদ আছে--- 'কাকের চোখে তার ছানা সোনার ছানা'।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের উচ্চারণ বক্তার পক্ষে কিছুটা পরিশ্রম সাপেক্ষ। তামিল ভাষায় মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন না থাকায় তামিলরা দা বি করে যে তাদের ভাষা অনায়াসে বলা যায়, তাই সেটা অতি মিষ্ট। তামিল মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী বলেছেন, তাঁর জান া ভাষাগুলির মধ্যে তামিলই মিষ্টতম । তিনি পাঁচ-ছয় ভাষা জানতেন---ফরাসি ও বাংলা -সহ। কিন্তু আমার বাঙালি বন্ধুরা তো ঠাট্টা করে আমাকে বলেন, একটি টিনের কোটোয় কিছু নুড়ি রেখে কৌটোটাকে জোরে নাড়লে যে আওয়াজ হয়, তরই মত তাঁদের শোনায় তামিল কথাবার্তা!

প্রতিটি ভাষাতেই মৃদু এবং কঠিন এই দুইরকম ধ্বনি থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ভাষায় মৃদু ধ্বনির ব্যবহার বেশি, আর কোনো কোনো ভাষায় কঠিন ধ্বনির প্রাধান্য । সুতরাং প্রথমোক্ত ভাষাগুলি মিষ্টি শোনায়। তাছাড়া কঠিন ধ্বনিযুক্ত ভাষ াও উচ্চারণের শিথিলতার জন্য অপেক্ষাকৃতভাবে মিষ্টি শোনাতে পারে। এর উদাহরণ হচ্ছে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে মুনি চরিত্রগুলির কথাবার্তা। মৃদু ধ্বনির প্রাধান্য এবং অনায়াস উচ্চারণের ফলে বাংলা ভাষা অবাঙালিরও মিষ্টি শোনায়।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত বিপ্লবী কমলা দশগুপ্ত মহাশয়ার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই লেখার ইতি টানছি---
"পূর্ববঙ্গের লোকে যখন বসে মিষ্টি করেও গল্প করে, তখনও মনে হয় যেন ঝগড়া করছে, লাঠি খাড়া যেন। আর কলকাত া-কৃষ্ণনগরের লোকে যদি চেঁচিয়ে ঝগড়াও করে, তখনও তা কানে শুনে মিষ্টি লাগে। আমি কান পেতে ওদের মিষ্টি ভাষার ঝগড়া শুনতেও ভালবাসি।"

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com